দৈনিক খবর

০৬৯

অক্সিজ ১৪ SEP ৯৭
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

মতামত

যে ভাবনা সার্বজনীন

কারো ব্যক্তিগত ভাবনা যে এভাবে অন্য কারো ভাবনাকে ছুঁয়ে যায় সরদার ফজলুল করিম সাহেবের উপ-সম্পাদকীয় "ব্যক্তিগত ভাবনাঃ গতকালের" তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি একান্তই ব্যক্তিগত কিছু ঘটনাপ্রবাহ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন— যা ছাপার পর আর ব্যক্তিগত থাকেনি। এর সার্বজনীনতা ছড়িয়ে পড়েছে দূর হতে দূরান্তরে। ব্যক্তিগত থেকে সমষ্টিগত এবং এরপর এর ব্যাপ্তি রাষ্ট্রীয় ভাবনার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

জনাব করিম দেশের শিক্ষা প্রশাসনের প্রধান প্রায়োগিক কেন্দ্র শিক্ষা ভবনে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর চাকরিগত যে জটিলতার সম্মুখীন হয়েছেন তা শুধু কোন ব্যক্তির সমস্যা নয় বরং সমগ্র শিক্ষা প্রশাসনেরই সমস্যা— এ কথা আর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না। এমন হাজারো প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক... প্রতিনিয়ত এই দফতরের উঁচু পাঁচিলে মাথা ঠুকছেন। জানি না আরো কত দিন লিখতে হবে এঁদের সমস্যার কথা। কবে মানুষ গড়ার কারিগর— এ দেশের শিক্ষক সমাজ হয়রানিমুক্ত হবেন। কবে তারা সমস্ত ঝুট-ঝামেলা পেরিয়ে মানুষ গড়ায় আত্মনিয়োগ করবেন। কবে আবার সোনার মানুষে এ দেশ ভরে উঠবে। কেউ কি এর সঠিক জবাব দিতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করতে চাই এবং আমার অভিজ্ঞতাও ঐ শিক্ষাভবনকে নিয়েই।

সন ১৯৬৯। আমার পিতা একটি পিটিআই-এর সহকারী সুপার। সুনামের সাথেই তিনি চাকরি করছিলেন। হঠাৎ খবর এলো আমার বাবার থেকে সবদিক দিয়ে জুনিয়র দু'জন সহকারী সুপারকে বাবাকে ডিঙিয়ে প্রমোশন দেয়া হয়েছে। যতদূর মনে পড়ে সে সময় শিক্ষা ভবনের 'ট্রেনিং এণ্ড ম্যান পাওয়ার' শাখার এডিপিআই ছিলেন জনৈক মতিন সাহেব। নিরীহ এবং শান্ত মানুষ। তাঁকে গিয়ে বললাম বিষয়টা। তিনি বললেনঃ আচ্ছা দেখি খোঁজ নিয়ে। উনি খোঁজ নিলেন। মাস তিনেক পর উনি বললেনঃ একটু এদিক-ওদিক হয়ে হয়ে গেছে। ব্যাক ডেট থেকে তো আর প্রমোশন দেয়া যায় না। আপনার আব্বাকে বলুন শিগগির তাঁকেও প্রমোশন দেয়া হবে। তিনি আমার সামনেই ডিলিং কেরাণীকে ডেকে ধমকে-ধামকে দিলেন। ভবিষ্যতে যথাযথ তথ্য পরিবেশনে ব্যর্থ হলে ফলাফল খুব খারাপ হবে বলে ইঙ্গিত দিলেন। ব্যবস্থা ঐ পর্যন্তই। সিনিয়র বাবা আমার কপাল দোষে জুনিয়র হয়ে গেলেন।

তখন আজকের মতো ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট ছিলাম না। ছিলাম মফস্বল সংবাদদাতা। তাই সে যাত্রা ডিপিআই পর্যন্ত পৌঁছার মুরোদ হয়নি। তবে বাড়ী ফিরে এসে আব্বাকে বলেছিলামঃ মামলা করে দিন। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন পিতা জবাবে বলেছিলেনঃ হায়ার অথরিটি ভালো মনে করেছেন বলেই এমন করেছেন। চ্যালেঞ্জ করা ঠিক হবে না। এটা ইনসাবর্ডিনেশনের শামিল হবে। আমরা সব ভাই-বোন নানাভাবে অনুরোধ করেও তাঁকে তাঁর ভাবনা থেকে এক চুল টলাতে পারিনি।

সরকারের প্রতি অনুগত সেই আমার বাবা প্রমোশন পেলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের বছর '৭১ সালে। মাত্র দু'বছর পর তাঁকে এই প্রমোশন দেয়া হলো। তিনি যথারীতি আমাদের ছেড়ে অনেক দূরের এক পিটিআই-এ সুপারিনটেনডেন্ট পদে পোস্টিং পেলেন। আমরা তাঁর ছেলে-মেয়েরা পাক বাহিনীর তাড়া খেয়ে যখন দাদার বাড়ী-নানার বাড়ী ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছি সে সময়েই হলো এই প্রমোশন। নতুন স্থানে জয়েন করার আগে তিনি অনেক করে ভাবলেন জয়েন করবেন কিনা। কিন্তু চাকরিই যার সম্বল তার পক্ষে এছাড়া উপায়ই বা ছিল কি?

অবশেষে তিনি নতুন পদে যোগ দিলেন। দেশ স্বাধীন হলো। আর সাথে সাথে তার বেতন গেল বন্ধ হয়ে। সারা দেশে তখন তদন্ত শুরু হয়েছে। দালালী করে প্রমোশন গ্রহণকারীদের খুঁজে বের করে তারপর বেতন দেয়া হবে। আমরা গিয়ে বললামঃ দু'বছরই যখন দেরী হলো তখন আর ৪টা মাস দেরী হলে ক্ষতি কি ছিল। শুধু শুধু দালালীর খাতায় নাম পড়লো। অফিসিয়াল নেগলিজেন্সীর জন্য আব্বা আমার জুনিয়র হলেন। দু'বছর বর্ধিত বেতন ভাতা থেকে বঞ্চিত হলেন। আবার দালালীর খাতায়ও নাম পড়লো। অবশেষে তদন্ত রিপোর্ট বেরুলো কোন তদবির ছাড়াই স্বাভাবিক নিয়মে পদোন্নতি হয়েছে— তাই বেতন চালু করা যেতে পারে।

বেতন চালু হলো। হঠাৎ করেই আবার তা বন্ধ হয়ে গেল। এবার কি কারণ? পদোন্নতির ব্যাপারে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিকোমেন্ডেশন নেই। অনেক দৌড়-ঝাঁপের পর ফাইলের হদিস করা গেল। রিকোমেণ্ডেশন হয়েছে। বেতন আবার চালু হলো। এরপর আবার বেতন বন্ধ। কেন? যে পদে তাঁকে লিয়েন দেয়া হয়েছে সেই পদের মঞ্জুরি নেই। এজন্য শিক্ষা ভবনে দৌড়াদৌড়ি করতে হলো কয়েক দফা। মঞ্জুরিও পাওয়া গেল। এভাবে বেশ কিছুদিন শিক্ষাভবন— এজি অফিস দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে। পে স্লিপের জন্য দিনের পর দিন ফিরে আসতে হয়েছে। ডিলিং অডিটরের সন্ধান করলে কলিগরা বলেছেনঃ চা খেতে গেছেন। বসুন। আসবেন এখুনি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো শুধু সেদিনই নয়— পরের দিন এবং তারও পরের দিন তাকে পাওয়া যায়নি। অনেক চেয়ার ফাঁকা থাকলেও সেখানে দিনের পর দিন কোট ঝুলে থাকতে দেখা গেছে।

এ ব্যাপারে শিক্ষা ভবনের একজন কর্মকর্তাকে বলেছিলাম পিটিআই আছে, পদ আছে কিন্তু সেগুলোর মঞ্জুরি নেই কেন? বছরের পর বছর ধরে এসব পদের মঞ্জুরি নিতে হবে কেন? পিটিআইগুলো কি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে? উক্ত কর্মকর্তা এর কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি।

এতক্ষণ অনেকগুলো সমস্যা কাটিয়ে ওঠার কথা যত সহজে বললাম বাস্তবে তা কিন্তু তত সহজ ছিল না। ফাইলের পিছে চরকির মতো কি পরিমাণ যে ঘুরতে হয়েছে তার একটা নমুনা দিচ্ছি।

সেই যে স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যে আব্বা নতুন জায়গায় যোগ দিলেন, স্বাধীনতার পরেও দীর্ঘদিন সেখানে থাকলেন তিনি। এদিকে আমাদের ভাইবোনদের লেখাপড়া লাটে ওঠার জোগাড়। আব্বাতো বিগ বসের কাছে যেতেই নারাজ। কি থেকে কি হয়ে যায়। শেষে চাকরি নিয়েই টানাটানি। তাই তিনি দরখাস্ত করা ছাড়া আর কিছু করতে আগ্রহী ছিলেন না।

অগত্যা বড় ছেলে হিসেবে আমিই দেখা করলাম ডিপিআই মহোদয়ের সাথে। তার ব্যবহারের কথা কোন দিন ভুলবো না। তিনি এডিপিআইকে বলে দিলেন ফাইলে নোট দিতে। সেকশনে ফিরে এসে দেখলাম ঘাপলা শুরু হয়েছে। কেরাণী সাহেব ফাইল খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি আমাকে বল্লেনঃ কাল আসুন। দেখি ফাইল খুঁজে বের করতে পারি কি-না। তথাস্তু। পরদিন অফিস খুলতে না খুলতেই আমি হাজির। কিন্তু কেরাণীর ভাব দেখে মনেই হলো না উনি আমাকে চেনেন। দুপুরের দিকে বিনীত স্বরে তাকে বিষয়টা স্মরণ করিয়ে দিলাম। জবাবে দুপুরের নাস্তার পর কাজটি সম্পন্ন হবে বলে তিনি জানালেন। কিন্তু সেদিন আর তিনি অফিসেই এলেন না।

পরদিন আমি কিছু বলার আগেই কেরাণী ভাই আগের দিন বিকেলে না আসতে পারার জন্য আফসোস করলেন এবং পেছনের র‍্যাকে গোটা পঁচিশেক ফাইল ঘেটে ঘুটে বললেনঃ সম্ভবতঃ ডিপিআই সাহেবের কাছে পুটআপ করা আছে ওটা। আমি হতোদ্যম হয়ে পড়লাম। একবার ভাবলাম এডিপিআই সাহেবকে বলি ফাইল না পাবার ব্যাপারটা। কিন্তু অনেক কষ্টে সে ইচ্ছা দমন করলাম। আমি এতদিন এ অফিসে ঘোরাঘুরি করে এ কথাটা বুঝেছি যে, চাপাচাপিতে ফাইল বের করালে কেরাণী বাবু নাখোশ হবেন এবং শেষ পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটাই ভেস্তে যেতে পারে। এখানে একটা বিষয় খুবই মজার যে, কেরাণী সাহেব পেছনের র‍্যাকে ফাইল খুঁজলেও তার সামনের টেবিলে ভুল করেও খুঁজলেন না একটি বারও।

এক সময় কেরাণী সাহেব কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গেলে আমি ঝোপ বুঝে কোপ মারলাম। পটাপট টেবিলের ফাইলগুলোর শিরোনাম দেখতে লাগলাম। এক সময় পেয়েও গেলাম। এই ফাঁকে ফাইলটি একটু বাঁ দিকে বাঁকিয়ে রাখলাম যাতে শিরোনামের অংশ বিশেষ দেখা যায়। বলে রাখা ভালো বদলির তদবির করতে গিয়ে ইতিপূর্বেই ফাইলটি আমার চেনা হয়ে গিয়েছিল। পরে কেরাণী সাহেব এলে হঠাৎ চোখে পড়েছে ভান করে আমি তার দৃষ্টি প্রত্যাশিত ফাইলের দিকে আকর্ষণ করে বললামঃ দেখুন তো এটাই বোধ হয় সেই ফাইল!

ভাগ্য ভালো আমাকে অপরাধী না করে ফাইলটি টেনে নিয়ে তিনি বার কয়েক আফসোস করলেন। বললেনঃ আহ! এখানে ক'বার খুঁজলাম, তবু পেলাম না কেন? এরপর এডিপিআই, ডিপিআই, কেরাণী হয়ে ফাইলটি বার কয়েক ঘুরপাক খেলো বটে, তবে আমার কাজটাও হয়ে গেল। প্রায় বিনা খরচায় ট্রান্সফার অর্ডারটি নিয়ে যখন আমি বেরিয়ে আসছিলাম তখন কেরাণী বাবুর বেদনাহত চেহারা আমাকেও আহত না করে পারেনি।

এর কয়েক বছর পরের কথা। আমি মফস্বল সাংবাদিকতা ছেড়ে পেশাদার সাংবাদিকতা জীবনে ঢুকে পড়েছি। সাল '৮০। তারিখ মে মাসের ২২। সারা জীবন সততার সাথে চাকরি করার এবং নিজের ক্ষতি অবধারিত জেনেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত সঠিক বিবেচনার পুরস্কার হিসেবে আমার পিতাকে বিভাগের বাইরে কিশোরগঞ্জ বদলী করা হলো। সেই সাথে তাকে এও বলা হলো যে, ২রা জুনের পর বর্তমান স্থলে তার চাকরি বিলুপ্ত বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ স্ট্যাণ্ড রিলিজ করা হয়েছে তাঁকে। অথচ আর মাত্র আড়াই বছর চাকরি বাকী তাঁর। সরকারী নিয়মে সাধারণভাবে চাকরির শেষ তিন বছর কাউকে ডিসটার্ব করা হয় না। শুধু তাই নয়, শাস্তিমূলক বদলীর ক্ষেত্রেই শুধু নিজ বিভাগের বাইরে বদলী করার নিয়ম রয়েছে।

পিতার চাকরির শেষ প্রান্তে আবারো আমাকে যেতে হলো শিক্ষা ভবনে। সংশ্লিষ্ট এডিপিআই আমাকে বললেনঃ কিশোরগঞ্জ পিটিআই-এর দুর্দিন যাচ্ছে। আপনার বাবা দক্ষ লোক। তাই ঐ প্রতিষ্ঠানটিকে সুশৃঙ্খল করতে তাঁকে দেয়া হয়েছে ওখানে। আমি বললামঃ পিটিআই-এ শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য আব্বা সেখানে গেলে আমার কচি ভাইবোনগুলো যে উচ্ছৃঙ্খল হবে— তা কি ভেবে দেখেছেন? আর বিভাগের বাইরে বদলী করায় তাঁর কলিগরা হাসাহাসি করছেন, বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চয়ই পিতা আমার কোন দুষ্কর্ম করেছেন। না হলে বিভাগের বাইরে বদলী কেন? এডিপিআই সাহেব আমার কথা লুফে নিলেন। মুচকি হেসে তিনি বললেন, না-না কোন দোষের জন্য তাঁকে বদলী করা হয়নি। আমি সার্টিফিকেট দিচ্ছি নিয়ে যান। ওনার কোন দোষ নেই।

অনেক কথাবার্তায়ও যখন চিড়ে ভিজলো না, তখন আমি ডিপিআই সাহেবের কাছে গেলাম। তখন ডিপিআই ছিলেন ড. হাফেজ আহমেদ সাহেব। ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন ছিল। আমার দেয়া দরখাস্তে চোখ বুলিয়ে তিনি গর্জে উঠলেন। ডাকলেন এডিপিআইকে। বললেনঃ বৃদ্ধ বয়সে ওনাকে বদলী না করলেই নয়? কি যে করেন আপনারা। তিনি তৎক্ষণাৎ আব্বার বদলীর আদেশ বাতিলের নির্দেশ দিলেন।

পানির মতো কাজ হয়ে গেল। এডিপিআই সাহেব বিকেলে গিয়ে অর্ডার নিয়ে আসতে বললেন। কথা অনুযায়ী বদলী বাতিলের আদেশ যখন আমার হাতে ধরিয়ে দেয়া হলো তখন এডিপিআই সাহেব বিরক্তির সাথে আমাকে বললেনঃ স্যারকে কি উল্টা-পাল্টা বুঝিয়েছেন? আমি জবাবে বলেছি— স্যার তো স্যারই। যারা সত্যিকারের স্যার তাদের কি সব কথা খুলে বলতে হয়?

এরপর ঐ এডিপিআই সাহেব রাজশাহী ডিডিপিআই অফিসকে আব্বার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। অধঃস্তন অফিস উপরওয়ালার হুকুমে তদন্তও করেছেন। রিপোর্টে সবগুলো অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে জানানোও হয়েছে। তবে অবাক ব্যাপার হলো এই যে, অভিযোগপত্রটি কেউ সই করে পাঠায়নি। অভিযোগগুলো (উদ্ভট) সাদা কাগজে শুধু টাইপ করা ছিল? নাম ঠিকানা ও স্বাক্ষরহীন কোন অভিযোগ অভিযোগ কিনা তা ঐ কর্মকর্তা জানতেন কিনা, তা আজো আমি জানতে পারিনি।

এম, রেজাউল করিম
রাজশাহী।